বনিক বার্তা, ২০১৫-০৭-২৭, পৃ:-০৪

বণিক বার্তা

ছয়-সাড়ে ছয় শতাংশ প্রবৃদ্ধির ফাঁদ থেকে উত্তরণে উদ্ভাবনী মুদ্রানীতি প্রয়োজন

ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন | ২০১৫-০৭-২৭ ইং

বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ও ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির প্রতিষ্ঠাতা উপাচার্য। বর্তমানে তিনি এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করছেন। সদ্য লুপ্ত পে-কমিশনের চেয়ারম্যানও ছিলেন তিনি। ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন স্বাধীন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ব্যক্তিগত সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগ থেকে স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করে শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন এ বিভাগেই। পরবর্তীতে যুক্তরাষ্ট্রের বোস্টন ইউনিভার্সিটি থেকে সাফল্যের সঙ্গে পিএইচডি করেন। তিনি সোনালী ব্যাংক, পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন ও বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থার চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেছেন। এছাড়া তিনি অগ্রণী ব্যাংক, সাধারণ বীমা করপোরেশন, ইনভেস্টমেন্ট করপোরেশন অব বাংলাদেশের পরিচালনা পর্ষদেরও সদস্য ছিলেন। আহ্ছানিয়া মিশন মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিনকে ‘খান বাহাদুর আহসান উল্লাহ গোল্ড মেডেল-২০১৩’ প্রদান করে। সম্প্রতি তিনি উচ্চমধ্যম আয়ের দেশে উত্তরণে করণীয়, বিনিয়োগ, ব্যাংকে সুশাসন, মুদ্রানীতিসহ নানা বিষয় নিয়ে বণিক বার্তার সঙ্গে কথা বলেন। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন এম এম মুসা

বিশ্বব্যাংকের হিসাবে বাংলাদেশ নিম্নমধ্যম আয়ের দেশ হলো। এক্ষেত্রে আপনার বিশ্লেষণ কী?

এটা প্রত্যাশিত ছিল। বিশেষ করে ২০১৪ ও ২০১৫ সালের অর্থহীন সন্ত্রাস ও নাশকতা না ঘটলে আরো এক বছর আগেই এটা অর্জন হতো। বিশ্বব্যাংকের হিসাবেই মাথাপিছু ১০৮৫ ডলারের আয় আমরা অতিক্রম করেছি ২০১৩ সালে। এ কৃতিত্বের দাবিদার মূলত দুটি পক্ষ। এক. জনসাধারণ তথা কৃষাণ-কৃষাণি ও শ্রমজীবী মানুষ, যাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলেই ধারাবাহিক জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জন হয়েছে।

দ্বিতীয়ত. প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অসাধারণ সাহস ও প্রজ্ঞা, উদ্ভাবনী নেতৃত্ব এবং উন্নয়নের পথে স্থিরচিত্ত নীতি কৌশলের কারণেও বাংলাদেশ নিম্নমধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হয়েছে। তবে নিম্নমধ্যম আয়ের দেশের যে স্বীকৃতি, সেটি উন্নয়ন সূচকের মাত্র একটা দিক, যা আসছে মূলত প্রবৃদ্ধি থেকে। এতে সামাজিক বা সাংস্কৃতিক উন্নয়ন অর্থাত্ অগ্রগতির বহুমাত্রিক দিকগুলো প্রতিফলিত হয়নি। অথচ জনসাধারণের চেষ্টায় সীমিত সম্পদেও বিশাল উন্নয়ন সম্ভাবনায় পৌঁছতে আরো অনেক দূর যেতে হবে। জাতিসংঘের স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে বের হয়ে আসতে মাথাপিছু আয় ছাড়াও দুটো বিষয় বিবেচনায় আসবে— ঝুঁকি মোকাবেলা সূচক ও হিউম্যান অ্যাসেট ইনডেক্স (এইচএআই) যেখানে আমাদের পেতে হবে ৬৬। এখন আছি ৬২ দশমিক ৮-এ। এ পথচলা আগামী দুই বছরেই শেষ করা যেতে পারে। তবে এক্ষেত্রে সরকারকে স্বাস্থ্য ও পুষ্টি এবং শিক্ষা খাতে আরো দৃষ্টি দিতে হবে। এ বছরের বাজেটে শিক্ষা খাতে গত বছরের তুলনায় মাত্র ৫৫ কোটি টাকা বেশি বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। বাজেটের পরিধি বেড়েছে ২০ শতাংশের মতো। শিক্ষা বাজেট বাড়ল সামান্যই, এটা বোধহয় ঠিক হলো না। শিক্ষা খাতে প্রমিত বরাদ্দ হলো জিডিপির শতকরা ৫ ভাগ। আমাদের দেশে পাঁচ বছর আগেও এটা ছিল ২ দশমিক ৫ এবং গতবার ছিল ২ দশমিক ২ শতাংশ। এবার তা শতকরা ২ ভাগেরও নিচে নেমে গেছে। স্বাস্থ্য খাতে অবশ্য বরাদ্দ না বাড়লেও বাস্তবায়ন দক্ষতার ওপর জোর দেয়া হয়েছে। শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ বাড়িয়ে তার উপযুক্ত ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। বেতন কমিশনের প্রতিবেদন পুরোপুরি বাস্তবায়ন হলে উৎপাদনশীলতা আরো বাড়বে। এদিকে এইচডিআই তথা হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ইনডেক্স অর্থাত্ মানবসম্পদ উন্নয়ন সূচকে মোট চারটি ক্যাটেগরি রয়েছে। সর্বোচ্চ, উচ্চমধ্যম, নিম্নমধ্যম ও নিম্ন। আমরা বহু বছর নিম্ন সূচকের দেশ ছিলাম। খুব অল্প দিন হলো এইচডিআই সূচকের দশমিক ৫৮৫ নিয়ে আমরা নিম্নমধ্যমে উঠেছি। এক্ষেত্রে আমরা যদি দশমিক ৭৫ সূচকে উঠতে পারি, তাহলেই উচ্চমধ্যম তালিকায় ওঠা সম্ভব হবে। সমন্বিত ও কৃতসংকল্প প্রচেষ্টায় আগামী পাঁচ-ছয় বছরে এ লক্ষ্য অর্জন সম্ভব হতে পারে। নিম্নমধ্যম আয়ের দেশ থেকে উচ্চমধ্যম মানবসম্পদ সূচকে ওঠাকে আমি বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করি। আমাদের সম্পদ সীমাবদ্ধতার টানাপড়েনে সামাজিক সুরক্ষাবলয়ে বেশি বরাদ্দ দিলে অবকাঠামোগত প্রবৃদ্ধি বাধাগ্রস্ত হয়। আবার অবকাঠামোয় বেশি বিনিয়োগ করলে সামাজিক খাতের উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হয়। এক্ষেত্রে ভারসাম্য রক্ষা করা কঠিন বৈকি!

নিম্নমধ্যম আয়ের দেশ থেকে উচ্চমধ্যম আয়ের দেশে যেতে বাংলাদেশকে কোন কোন খাতে অধিক নজর দিতে হবে?

বিশ্বব্যাংকের হিসাব অনুসারে মাথাপিছু আয় ৪ হাজার ১০০ ডলারে পৌঁছলেই বাংলাদেশ উচ্চমাধ্যম আয়ের দেশের স্বীকৃতি পাবে। এজন্য ২০৩০ সাল পর্যন্ত নিরলস প্রচেষ্টা চালাতে হবে। অবকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবার মানোন্নয়নে গুরুত্ব দিতে হবে। উন্নত করে তুলতে হবে যাতায়াত ব্যবস্থা। রাস্তাঘাটের সীমাবদ্ধতা আমাদের উন্নয়নের গতিকে শ্লথ করছে। বিদ্যমান বিরোধপূর্ণ বিষয়গুলো দ্রুত সমাধান করা জরুরি। রেলেও বড় ধরনের বিনিয়োগ করা উচিত। অন্তত ন্যারো গেজ থেকে ব্রড গেজে যাওয়া জরুরি। আবার ডাবল লাইনও নির্মাণ করতে হবে। ছোটবেলা দেখেছি, আখাউড়া জংশনে সীমিত আকারে বৈদ্যুতিক রেল চলাচল করত। আগামীতে রেলের অন্তত আংশিক বৈদ্যুতিকীকরণ করা যেতে পারে। নৌপথ এককালে বহুল প্রচলিত থাকলেও আস্তে আস্তে সেটা সংকীর্ণ হয়ে আসছে, চার দশক আগের তুলনায় মাত্র এক-চতুর্থাংশ। এক্ষেত্রেও ব্যাপক অগ্রগতি সম্ভব।

আমাদের জিডিপি কেন ৬ শতাংশের ঘরে আটকে রয়েছে?

ব্যক্তিখাতে বিনিয়োগ স্থবিরতাই এর প্রধান কারণ। স্বাধীনতা অর্জনের পর থেকে ধারাবাহিক হারে জিডিপি বেড়েছে। প্রতি দশকে নির্দিষ্ট পরিমাণে বাড়লেও এ প্রবৃদ্ধি গতি পায় নব্বইয়ের দশকে এসে। বিশেষ করে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা পেলে অন্য সব খাতের মতো অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিও গতি লাভ করে। বলা হয়, প্রতি দশকে প্রবৃদ্ধির হারে এক শতক যুক্ত হয়েছে। কিন্তু ২০০১ সালে শুরু হওয়া দশকে এসে সেটি থমকে দাঁড়ায়। দেশে শিল্প স্থাপনের চেয়ে বেশি লাভজনক ব্যবসা-বাণিজ্য। এটা উন্নয়নের পথে সামান্য কিছুটা সহায়ক, কিন্তু বেশিটাই আত্মঘাতী। শিল্পে যে প্রবৃদ্ধি হওয়ার কথা ছিল, সেটি হয়নি। ফলে প্রবৃদ্ধির গতিটা যে দ্রুতগতিতে বাড়ার কথা ছিল, সে হারে বাড়েনি। শিল্পায়নে আরো গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন। আমাদের মুদ্রানীতিটাও এক বছর ধরে খুব বেশি প্রবৃদ্ধি সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারছে না। সফল মুদ্রানীতি মূল্যস্ফীতিকে শতকরা ৬ ভাগের সামান্য উপরে নামিয়ে এনেছে। তবে এটা প্রবৃদ্ধি সহায়ক হয়নি। মুদ্রনীতিকে আরো উদার করতে হবে। বিনিয়োগের পরিবেশ উন্নয়নে আরো গুরুত্ব দিতে হবে। সংকোচনশীল মুদ্রানীতি বিনিয়োগ ও প্রবৃদ্ধি সহায়ক নয়। মুদ্রানীতি সম্প্রসারণশীল হলে বিনিয়োগকারীরা আকৃষ্ট হবেন বেশি। রেপো হার হ্রাস করা প্রয়োজন। বিদ্যুত্ ও জ্বালানি খাতে বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। কয়লাভিত্তিক বিদ্যুেকন্দ্র স্থাপনে দৃষ্টিটা সময়োচিত হয়েছে। সরকার যথার্থভাবেই পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। বাগেরহাটের রামপালে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুেকন্দ্র নির্মাণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এর বিরোধিতা দুঃখজনক। পরিবেশ রক্ষা করেই আমাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে হবে। কিন্তু আগে বিনিয়োগ, প্রবৃদ্ধি ও আর্থসামাজিক উন্নয়ন হোক। পরিবেশের দিকটা না হয় পরেই দেখা যাবে।

দুষ্প্রাপ্য ভূমি হস্তান্তরে বাধা দূর করতে বিধি প্রণয়ন জরুরি। কোরিয়ান ইপিজেডের সমস্যা দ্রুত সমাধান করতে হবে। সেখানে জমির পরিমাণ অনেক বেশি। সমঝোতা ও আলোচনার মাধ্যমে তাদের কিছু জমি ফেরত নেয়া সম্ভব হলে আরো যারা এক্ষেত্রে আগ্রহী যেমন— চীন, জাপান কিংবা ভারতকে তা বরাদ্দ দেয়া যেতে পারে। পাশাপাশি রেলের পতিত জমিতেও অর্থনৈতিক অঞ্চল তৈরি করা যেতে পারে। প্রাইভেটাইজেশন কমিশন পতিত জমির ব্যাপারে একটা হিসাব দিয়েছে। ওই জমি শিল্পায়নে ব্যবহার করা যেতে পারে।

সম্ভাবনা সত্ত্বেও বিদেশী বিনিয়োগ আকর্ষণে বাংলাদেশ পিছিয়ে কেন?

পৃথিবীতে ১ হাজার ৮০০ কোটি বিলিয়ন ডলার প্রত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগ হয় প্রতি বছর। আমরা পাই ১-২ কোটি ডলার। চীন, ভারত, ভিয়েতনাম, সিঙ্গাপুর ও পাকিস্তান অনেক বেশি প্রত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগ পায়। এক চীনেই প্রতি বছর প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ যায় প্রায় ৮৫ বিলিয়ন ডলার। আন্তর্জাতিক সংস্থা ও কোম্পানিগুলো বাংলাদেশকে বিনিয়োগের ব্যাপক সম্ভাবনাময় স্থান হিসেবে উল্লেখ করছে। এক্ষেত্রে বিদেশী বিনিয়োগ না আসার সম্ভবত একটি বড় কারণ রাজনৈতিক অস্থিরতা। যারা স্বাধীনতার বিরুদ্ধ অবস্থানে অটল রয়েছে, তারা যেন অন্য রাজনৈতিক দলের সহায়তা নিয়ে দেশে নাশকতা না চালাতে পারে, সে বিষয়ে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। যারা বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও উন্নয়নে বিশ্বাসী কিন্তু বর্তমান সরকারের বিরোধী, তাদের সঙ্গে নিয়ে কাজ করার পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে। সরকার স্বাধীনতাবিরোধীদের সঙ্গে আলোচনা করতে পারে না। সেই সঙ্গে যারা স্বাধীনতাবিরোধীদের আশ্রয়-প্রশ্রয় দিয়ে থাকে, তাদের সঙ্গেও আলোচনা করা মুশকিল। তার পরও আলোচনার মাধ্যমে দেশে একটি জাতীয় ঐকমত্য সৃষ্টি করে আরো বিনিয়োগবান্ধব করা যেতে পারে।

বিনিয়োগ বোর্ডকে আরো শক্তিশালী করা প্রয়োজন। সংশ্লিষ্ট সংস্থার নির্বাহী চেয়ারম্যানের ক্ষমতা আরো বাড়িয়ে দেশের চৌকস মানবসম্পদ বিশেষজ্ঞদের এক্ষেত্রে কাজে লাগানো যেতে পারে। পাশাপাশি

বিনিয়োগ বোর্ডের সঙ্গে যুক্ত সব ধরনের আইনি জটিলতা দূর করতে হবে। এখানে মানবসম্পদ উন্নয়নে বৈদেশিক বিনিয়োগ আকর্ষণ করায় সচেষ্ট হতে হবে। ফাইভ ওয়ার্কিং ডে ওয়ান স্টপ সার্ভিস চালু করা যেতে পারে। গত বছর ১৫ দশমিক ২৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার রেমিট্যান্স হিসেবে পেয়েছি আমরা। কিন্তু ৪ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি অর্থ আবার চলে গেছে দেশের বাইরে আউট ফ্লো হিসেবে। এক্ষেত্রে লেখাপড়াকে ব্যবহারিক করার জন্য হাতে-কলমে কাজের ব্যবস্থা নিতে হবে। পালাক্রমে তাত্ত্বিক বিদ্যা ও বাস্তব কর্মক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা বাড়ানোর ব্যবস্থা নিলে কোম্পানিগুলোও কম মূল্যে দক্ষ জনশক্তি পাবে। এতে বিদ্যার্থী ও শিল্পপ্রতিষ্ঠান উভয়ই উপকৃত হবে। শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানো প্রয়োজন। বিদেশে অবস্থানরত আমাদের দক্ষ ব্যক্তিদের দেশে এনে কাজে লাগাতে হবে। কয়েকটি প্রতিষ্ঠান, পত্রিকা ও বিজ্ঞজন অনবরত অযৌক্তিকভাবে নেতিবাচক প্রচারণা চালাচ্ছেন। তবে ব্যক্তিখাতে বিনিয়োগ বিমুখতা, দুর্নীতি, সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি ও রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা দূর করা এবং অবকাঠামো নির্মাণে বিশাল অগ্রগতি করতে পারলে দুই অঙ্কের জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জন অদূর ভবিষ্যতেই সম্ভব হতে পারে। অবশ্য সুশাসন প্রতিষ্ঠা পেলেই মূলধন-উৎপাদনের মধ্যকার অনুপাত কমে যাবে এবং সমপরিমাণ বিনিয়োগ থেকে বেশী পরিমাণ জিডিপি বৃদ্ধি হবে।

বেসরকারি বিনিয়োগ কমে যাচ্ছে কেন?

ব্যবসায় মুনাফা কমে গেলে শিল্পে বিনিয়োগ কমে যাবেই। তবে এক্ষেত্রেও সরকারের দায়টা বেশি। বিষয়টি নিয়ে সরকারের পক্ষ থেকে গভীরভাবে ভাবতে হবে। সরকারের উচিত যারা এ বিষয়ে ওয়াকিবহাল তাদের নিয়ে একযোগে কাজ করা। পাশাপাশি ব্যক্তিখাতের বিনিয়োগ বিমুখতা কমাতে হবে, নীতিকৌশল, অবকাঠামো নির্মাণ ও স্থিতিশীল পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে।

বাংলাদেশের বড় বড় গ্রুপ এখন ঋণখেলাপি। তার কোনো প্রভাব বিনিয়োগে পড়ছে কি?

সবক্ষেত্রে বিষয়টি সঠিক হয়। বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ হয়তো নিজ নিজ দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টি বিশ্লেষণ করছেন। তবে খেলাপি ঋণ আদায়ের পাশাপাশি অনেককে সুবিধা দিয়ে বিনিয়োগে আকর্ষণ করার চেষ্টাটাও সমান্তরালে চলছে। তবে খেলাপি নন তেমন দক্ষ ও দেশপ্রেমিক শিল্পপতি রয়েছেন। খেলাপিদের অযৌক্তিক সুবিধা দিলে তারা নিরুৎসাহিত হবেন। এখন খেলাপি ঋণের পরিমাণ ৫৫ হাজার কোটি টাকা। দুঃখজনকভাবে ২০০৩ সালে সুদ ও ঋণ অবলোপনের অসুস্থ ধারা সৃষ্টি করা হয়। ফলে ৩৭ হাজার কোটি টাকা অবসায়ন করা হয়েছে। অবসায়ন করার জন্য সাধারণ মানুষের ব্যাংক আমানত খাটিয়ে যে মুনাফা অর্জন হয়, তার অংশবিশেষ সঞ্চিতি করতে হয়। তাই অবসায়নে একটা নীতিমালার মারাত্মক কনফ্লিক্ট অব ইন্টারস্ট কাজ করে। এটা পরিত্যাজ্য। যারা দীর্ঘমেয়াদি ঋণ পুনর্গঠন চাইবেন তারা যেন ক. সংশ্লিষ্ট শিল্পপ্রতিষ্ঠানের একটি হালনাগাদ চিত্র জমা দেন; খ. পুনঃতফসিলকৃত ঋণের বিপরীতে একটি লাভজনক প্রতিষ্ঠান বন্ধক দেন; গ. ব্যক্তিগত গ্যারান্টি প্রদান করেন; ঘ. হিসাব-কিতাবে প্রদেয় ডাউন পেমেন্ট জমা দিয়ে তবে পুনঃতফসিলের আবেদন করেন এবং ঙ. পুনঃতফসিলের শর্তভঙ্গ করলে খেলাপি ঋণের পূর্বাবস্থা ফিরে আসবে বলে অঙ্গীকারনামা দেন। অনেকে গোল্ডম্যান স্যাকসকে দিয়ে ঋণ পুনরুদ্ধারের উদ্যোগ নিতে চেয়েছিল ২০০০ সালে। এমন উদ্যোগ নিয়েও খেলাপি ঋণের অভিশাপ থেকে মুক্ত হওয়া যেতে পারে।

নব্বইয়ের দশকে ১০ জন শীর্ষ ঋণ খেলাপি চিহ্নিত করে বাংলাদেশ ব্যাংকের খামে লেখা হয়েছিল ঋণখেলাপ হচ্ছে অর্থনৈতিক সন্ত্রাস। কিন্তু অবাক করার বিষয় হচ্ছে, এখন পর্যন্ত এ তালিকার শীর্ষভাগে তেমন কোনো পরিবর্তন হয়নি। আগের লোকগুলোই এখনো খেলাপি। ঋণখেলাপিরা ধিকৃত এবং ব্যাংক

কেলেঙ্কারির সঙ্গে সংশ্লিষ্টগণ যদি সমাজে বর্জিত হয়, তাহলে তা আখেরে ভালো ফল দিতে পারে।

বাজেটে রাজস্ব আহরণের যে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে. সেটা কতটা অর্জনযোগ্য বলে মনে করেন?

এ লক্ষ্য অর্জন সম্ভব এবং উচিত। কারণ রাজস্ব বাড়াতে গবেষণা ও উদ্যোগ নেয়া হয়েছে এবং হচ্ছে। এক্ষেত্রে উপযুক্ত আইনের আওতায় এনে রাজস্ব প্রদানে উদ্বুদ্ধ করতে হবে সবাইকে। আমি বলে থাকি, শতকরা ১০ ভাগ উচ্চবিত্ত। অর্থাত্ ৪০ লাখ পরিবার ৩৭-৩৮ শতাংশ আয় ও সম্পদের মালিক। তাহলে কেন মাত্র ১০ লাখ লোক কর দেবে। বাকি ৩০ লাখ পরিবারের কর প্রদানের পরিস্থিতি-পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। পুরো রাজস্ব ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে পারলে এক্ষেত্রে সাফল্য আসতে বাধ্য। তবে কর আদায়ের বিভিন্ন কৌশল আছে। অনেকে তার বেতনের বাইরেও প্রচুর আয় করেন সিটিং অ্যালাউন্স হিসেবে, যেগুলো করের আওতায় আসে না। এ ধরনের বেতনবহির্ভূত আয়ের ওপর উৎস কর কর্তন বাধ্যতামূলক করা যায়। এভাবে রাজস্ব আহরণ অনেক বাড়বে। বেসরকারি খাতে বড় কর্তারা বেতনের বাইরে অনেক আর্থিক সুবিধা পাচ্ছেন। সেখান থেকে কেন টাকা কেটে নেয়া হচ্ছে না। আমাদের উন্নয়নের জন্য এখন অনেক অর্থ প্রয়োজন। সেক্ষেত্রে বেশি রাজস্ব আহরণের বিকল্প নেই। একটু খেয়াল করলে দেখা যাবে, অধিকাংশ মিষ্টির দোকান কিংবা ওষুধের দোকান ভ্যাট দিচ্ছে না। এক্ষেত্রে পুরো বছরে তাদের কী পরিমাণ বেচাকেনা হয়, সেদিকে দৃষ্টি দিয়ে বার্ষিকভাবে ভ্যাট কেটে নিতে পারে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড। তবে কর আহরণের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও ন্যায়নিষ্ঠতা থাকতে হবে। অর্থনীতির শক্তিমত্তা ও সক্ষমতা অনুসারে আর্থসামাজিক উন্নয়নে বিনিয়োগের জন্য কর রাজস্ব আহরণে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা নিতে হবে।

আয়বৈষম্য ও সম্পদের বৈষম্য কেন কমছে না?

এটা বাজার অর্থনীতির মাধ্যমে অর্জিত উন্নয়নের একটা অপরিহার্য দিক। যারা যোগ্য ও বেশি শিক্ষিত, তারা বেশি আয় করবেন, এটা স্বাভাবিক। তবে প্রতিটি ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা আমাদের কর্তব্য। এখন দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করা জনগোষ্ঠীর সংখ্যা চার কোটির মতো। আর ১৯৭২ সালের দিকে এ জনগোষ্ঠী ছিল পাঁচ কোটির মতো। কিন্তু খেয়াল করতে হবে, ১৯৭২ সালে সাড়ে সাত কোটির মধ্যে ছিল পাঁচ কোটি। এখন জনসংখ্যা ১৬ কোটি। সেদিক থেকে দেখলে বলতেই হবে, দারিদ্র্য কমেছে। আমরা ছেলেবেলায় দেখেছি, মানুষ গ্রামে গামছা পরে খালি পায়ে চলাচল করছে। এখন সেসব নেই বললেই চলে। সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন আয়ের মধ্যে বৈষম্য অনেক বেড়েছে বটে। তবে এখন উন্নত হয়েছে জীবনযাত্রার মান। কিন্তু যারা একটু বেশি বুদ্ধিমান তারা লেখাপড়া বেশি করেছে, বেশি উন্নত হয়েছে। তার মানে এই নয় যে, তারা সবাই বৈধ পথে অর্জন করেই পর্বতের চূড়ায় বসেছে। এক্ষেত্রে যা হওয়ার হয়ে গেছে। ভবিষ্যতে যেন এমন ঘটনা না ঘটে, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। তবে নিম্ন আয় ও অনগ্রসর অঞ্চলের মানুষও আগের তুলনায় ভালো আছে, তা বলতেই হবে।

এবারের মুদ্রানীতি কেমন হওয়া উচিত?

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মূল কাজ মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করা। মূল্যস্ফীতি এখন ৬ দশমিক ১ শতাংশ। অনেক বড় বড় অর্থনীতিবিদ মনে করেন, ৭-৮ শতাংশ মূল্যস্ফীতি বরং প্রবৃদ্ধি সহায়ক। এবারের মুদ্রানীতিটা তাই একটু উদার করা প্রয়োজন। এতে রেপো এবং তার মাধ্যমে সাধারণ সুদহার কমে আসার সম্ভাবনা তৈরি হবে। আর সুদহার কমলে বিনিয়োগ বাড়ার সম্ভাবনাও অনেক দিক থেকে বেড়ে যাবে। সম্প্রসারণশীল উদার মুদ্রানীতি হওয়া প্রয়োজন, যেটা বিনিয়োগ সহায়ক হবে। এর সঙ্গে এমন কিছু নীতি গ্রহণ করতে

হবে, যাতে খেলাপি ঋণের পরিমাণ কমে আসে। গতি আসে মূলধন বাজার থেকে বিনিয়োগযোগ্য তহবিল আহরণে। ছয়-সাড়ে ছয় শতাংশ জিডিপি প্রবৃদ্ধির ফাঁদ থেকে উত্তরণে একটি উদ্ভাবনী মুদ্রানীতি প্রয়োজন। নিষ্ক্রিয় মুদ্রাবিনিময় হার ও বৃহত্ রিজার্ভের ফলে টাকার মান বেড়েছে, কমেছে রফতানি বৃদ্ধির হার। অথচ সজ্ঞান অবমূল্যায়নে ভারত, পাকিস্তান ও ভিয়েতনামের মুদ্রার মান কমে রফতানি প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বেড়েছে উল্লেখযোগ্যভাবে, বেড়েছে রফতানি প্রবৃদ্ধির হার। টাকার অব্যাহত মূল্যমান বৃদ্ধি রেমিট্যান্সপ্রবাহেও নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। এসব বিষয়ে আশু পদক্ষেপ জরুরি। বড় বড় অবকাঠামো প্রকল্পে রিজার্ভ ব্যবহারের প্রক্রিয়া বের করা প্রয়োজন।

বিনিয়োগ কমে আসার পেছনে আর্থিক ব্যবস্থাপনা কি কোনো প্রভাব ফেলেছে?

এটা বিবেচনা করে দেখার মতো বিষয়। তবে কতগুলো বড় বড় ঘটনা ঘটেছে, যেগুলো বিনিয়োগকে প্রভাবিত করেছে। যেমন হল-মার্ক, বিসমিল্লাহ গ্রুপ কিংবা ডেসটিনির মতো ঘটনা এক্ষেত্রে দায়ী। এসব কেলেঙ্কারিতে জড়িত অনেকেই আবার এখন সরকার নিয়ন্ত্রিত পদ-পদবি পাচ্ছে। এটি আশনিসংকেত।

সরকার তো ব্যাংকিং কমিশন গঠন করতে চাইছে। এতে কি বিদ্যমান সমস্যার সমাধান হবে?

এটা নিঃসন্দেহে ভালো উদ্যোগ। পরিস্থিতির বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাংকিং কমিশন কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারবে। তবে ব্যাংকিং কমিশনের কাজের আওতা আরো বাড়াতে হবে। তাদের সুপারিশ বাস্তবায়নের ওপরও এর সফলতা নির্ভর করবে। কমিশনের নেতৃত্ব যেন বলিষ্ঠ, বস্তুনিষ্ঠ ও সাহসী হয়।

অনুলিখন: সালিম অর্ণব

আলোকচিত্রী: ডমিনিক হালদার